রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে মধুসূদন চরিত্র

ড.শ্যামাশ্রী মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়
Email ID.: shyamasri.mondal@gmail.com Mobile No.: 9153370267

রবীন্দ্রনাথ আজীবন সুন্দরের পূজারী, আদর্শবাদী, সীমার মধ্যে অসীম এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের সন্ধান করে গেছেন। আত্মসাধনার মধ্যদিয়ে নিজেকে ও নিজের ভাবনাকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর সাহিত্যে এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে, সেখানে আমরা দু’ধরনের চরিত্রকে দেখতে, পাই, এক উচ্চস্তরের আদর্শবান মানুষ, সেই চরিত্রগুলির কোন বিকাশ নেই, তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকে, আসলে তারা শিল্প মানব, রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মানুষ, যেমনটি তিনি হতে চেয়েছিলেন। আর এক ধরনের মানুষ হল সাধারণ মানুষ, রক্ত মাংসের মানুষ, যারা প্রতিপদে ভুল করতে করতে এগিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে আদর্শ মানুষের মতের মিল হয় না, তাদের মধ্যে এক প্রকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের 'মধুসুদন' হল এক সাধারণ মানুষ, ঘোষাল বংশের যোগ্য উত্তরসূরী আর এর পাশে আদর্শ চরিত্র হল কুমুদিনী ও বিপ্রদাস। এদের সঙ্গে মধুসূদনের কখনও মতের, রুচির মিল হয় না। মধুসূদন নিজেই তাদেরকে উচ্চমানের মানুষ মনে করেছে।গরীব সংসারে অনেক লড়াই করে সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সাহিত্য ও সৌন্দর্য নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই, সে তার পূর্বপুরুষদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে।এই দিক দিয়ে সে সম্মান পাওয়ার যোগ্য, এছাড়া সে নিজের পরিবারকেও লক্ষ রেখেছেস। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপরের মতো জীবন অতিবাহিত করেনি।নিজে মালিক হয়েও একজন কর্মচারীর জন্য যা নিয়ম, নিজের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের লঙ্ঘন হয়নি।নিজের কর্মে সে একনিষ্ঠ ছিল, কঠোর আত্মসাধনার মধ্যদিয়ে সে নিজেকে সাফল্যের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে।তবে ভারতীয় হলেও তার মধ্যে কোনো স্বাজাত্য বোধ নেই, সে অনায়াসে ইংরেজদের পদলেহন করেছে, নিজের লোকের তুলনায় ইংরেজদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেছে, তাদের সঙ্গে তার উঠা বসা, তার মিত্র -- তার স্ত্রী কুমুদিনী এই বিষয়ে লক্ষ করেছে –“এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে, আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে খুব নিয়তই বিকশিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য”. [১] তার জীবনের একটাই লক্ষ্য টাকা রোজগার করা। সবার উপরে যাওয়া। সে, নীরস, কঠোর, অহংকারী।স্ত্রী, কুমুদিনীকে দেখার আগে প্রেম-ভালোবাসার কোনো মূল্য ছিল না তার কাছে, তবে সে নির্লিপ্ত নয়, ত্যাগীও নয়, আবার ভোগীও নয়, সে হিসেবী। তার চরিত্র সপর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – “মধুসূদন যান্ত্রিক ব্যবসায় সাফল্য জগতের অধিবাসী, প্রতিবাদহীন, উদ্ধত আধিপত্য ও অবাধ প্রভুত্ব বিস্তার তাহার জীবনের কাম্যতম প্রবৃত্তি”।[২] আলোচ্য উপন্যাসে মধুসূদন চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

মধুসূদনের ব্যক্তি পরিচয়: রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে মধুসূদন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র।ছোটবেলা থেকে অন্য রকম, খোলা মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর বদলে সে আড়তের প্রাঙ্গণে পাটের গাঁটের উপর চড়ে বসে।যাচনদার খরিদদার গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান্দের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি, সেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাধাঁ বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।বাবা মার ইচ্ছে ছেলে লেখাপড়া শিখে 'ভদ্দোর' শ্রেণিতে উঠবে।তার পরে ঘোষাল-বংশদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।কিন্তু অকালেই বাবার মৃত্যুতে মধুসূদনের পড়া আর এগোতে পারে না।সে রোজগার শুরু করে দেয়, প্রথমে নিজের বই বিক্রি করে, তারপর সে ছাত্র মহলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই বিক্রি করে। তারপর নামজাদা কেরসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত বড়ো লোক বন্ধুর বাবার সাহায্যে প্রথমে সে রজবপুরে কেরোসিনের ডিলারসিপ পায়।তারপর – "সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল, সেই যাত্রাপথে কেরসিনের ডিপো কোন প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরে মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেললে ফেলতে ব্যাবসা হু হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায় খুচর থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদযোগপর্ব থেকে স্বর্গারহণে"।[৩] তার রূপ সম্পর্কে কথক বলেছেন —"মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে ··· গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী।কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথায় তেলো ঘেঁষে ছাঁটা।খুব আঁটসাঁট শরীর।যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে।··· সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে।যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই"।[৪] সে মহারাজা মধুসূদন ঘোষাল নামে পরিচিত হয়। বিয়ের বাজারে তার মূল্য অনেক, মেয়ের বাবারা পিছনে ঘুরলেও সে বিয়ে করতে রাজি নয়।মার অনুরোধও সে শোনে না।সে বলে উঠে " বিবাহ করতেও সময় নষ্ট, বিবাহ করেও তাই। আমার ফুরসত কোথায়?"[৫] তারপর বিয়ের বয়স অতিক্রম হয়ে যেতে থাকে, একদিন ঘোষাল কোম্পানির নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, ওদের ব্যবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলতে শুরু করল, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার নিয়োগ করা হল। রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষালবাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েছে 'মধুপ্রাসাদ'। মধুসূদন যখন কলকাতায় বাস করতে এল, তখন প্রথমে সে একটি পুরানো বাড়ি কিনেছিল, সেই চকমেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর-মহল। তারপরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশনে একটা মস্ত নতুন মহল এরই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠক-খানা-বাড়ি।এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত।বৈঠকখানাটি সাজানো, আধুনিক, সুন্দর, এই মহল সাজানোর দায়িত্ব মধুসূদনের ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যান্টের উপর, অন্যদিকে অন্তঃপুর, একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতস্যেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা – সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই, সারাদিন প্রয়োজন ছাড়াই কলে জল পড়ে চলেছে।এককথায় খুব নোংরা।শুধু উপরের তলার বসবাস করার মতো। সুতরাং অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। মধুসূদনের আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাস-মতোই।মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু

পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, বাটি, গ্লাস। খাদ্যসামগ্রী সাধারণত -- কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি। আসলে মধুসূসনের খিদে আছে, কিন্তু লোভ নেই।সে বিলাসী নয়।

মধুসূদনের বিবাহ ও তার দাম্পত্য জীবন: আলোচ্য উপন্যাসে নানা বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিবাহ ও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক।ঘোষাল-কোম্পানির নাম যখন দেশ-বিদেশে, ছড়িয়ে পড়ল, তখনই মধুসূদন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানায়। কন্যার বাজারে ক্রেডিট তার সর্বোচ্চ। অনেক সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও সে জানায় – 'ঐ চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই'। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "মধুসূদনের বিবাহে প্রেমের নাম-গন্ধও ছিল না – ইহা কেবল বংশাভিমানের ও উৎপীড়নপ্রিয়তার নির্মম অভিব্যক্তি".[৬]

মধুসূদন হল ঘা খাওয়া বংশের প্রতিনিধি, সে ঘা খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ঙ্কর। সে প্রতিশোধ নিতে চায়, দেখাতে চেয়েছে ঘোষাল পরিবার কত পয়সাওয়ালা ও তাদের কত প্রতিপত্তি। অন্যদিকে চাটুজ্যে পরিবারের প্রতিনিধি বিপ্রদাস এই বিয়েতে নিমরাজি ছিল, বার বার বোনের মত নিয়েছে কিন্তু তার বোন কুমুদিনী এই বিবাহকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করেছে। মধুসূদন মহারাজা বলে পরিচিত হলেও, তার সম্পর্কে কুমুদিনীর বাপের বাড়ির তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনে বলেছে 'হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল? ঐ-যে বেদেনীরদের গান আছে, এক-যে ছিল কুকুর চাটা শেয়ালকাঁটার বন/ কেটে করলে সিংহাসন। এ'ও সেই শেয়ালকাঁটা-বনের রাজা"।[৭] তার মত – 'ভালো বামনের ঘরে ওর বিয়ে চলে না'। এসব বলা সত্ত্বেও কুমুদিনী নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – "সে কুমুদিনীকে চাহিয়াছে প্রণয়িনীরূপে নহে, তার লাঞ্ছিত বংশগৌরবের সাহংকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, তার সর্বগ্রাসী দাম্ভিকতার পূর্ণতম পরিতৃপ্তি হিসেবে··· কুমুদিনীকে লইয়া তাহার হৃদয়বৃত্তির কোন কারবার নেই। আর কুমুদিনী, মধুসূদনকে চাহিয়াছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোবৃত্তি লইয়া – দৈবসংকেত তাহার স্বাভাবিক মধুর আত্মসমর্পণ-প্রবৃত্তিকে আরও ঘনীভূত করিয়াছে। ফুল যেমন তাহার বিকাশোন্মুখ সমগ্র হৃদয় লইয়া বসন্ত পবনের প্রতীক্ষা করে, বাঁশি যেমন করিয়া তাহার সমস্ত রন্ধ্রপথে ব্যাকুল আবেগ সঞ্চারিত করিয়া বাদকের ওষ্ঠ-স্পর্শের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, সেই রূপ কুমুদিনী তাহার হৃদয়ের পবিত্রতম, মধুরতম অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আদর্শ দয়িতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।যখন ডাক আসিল, তখন সে বিচার বিতর্ক না করিয়া, ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া, ··· সমস্ত দুর্লক্ষণ, অশুভ সংশয়, ভ্রাতার স্নেহপূর্ণ সতর্কবাণী, বহির্জগতের সন্নিগ্ধ নিষেধ – সে সবলে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার বিধি নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিবার জন্য পা বাড়াইল"[৮] সুতরাং কুমুদিনীর কাছে বিয়ের যে গুরুত্ব ছিল এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দেবার প্রবল যে ইচ্ছা ছিল তেমন কোনও মনোভাব মধুসূদনের ছিল না।যেন এক প্রকার শোধ নেওয়ার জন্য বিয়ে করা। বিয়ের আগে থেকেই তার দুর্ব্যহার শুরু হয়।বিয়ে করেই স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাবার প্রস্তাব দিলে কুমুর দাদা বিপ্রদাস বুঝতে পারে – "এটা প্রথার জন্য নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে"।[৯] বিয়ের পর স্ত্রী সম্পর্কে মধুসুদনের মনোভাব কথকের ভাষায় – "মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগেনি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করেনি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে — ইমারত জখম হয়নি।মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান

পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবন অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলা-নৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি, বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল.[১০]

কিন্তু তার হিসেবে ভুল হয়। বিয়ের পর সে স্ত্রীর সঙ্গে একের পর এক খারাপ ব্যবহার করে, যেমন -- কুমুকে নির্দেশ দেয় তার দাদার দেওয়া নীলা আংটি আঙুল থেকে খুলে ফেলতে। ফুলশয্যার রাতে কুমু জ্ঞান হারালে, সে কোনও সহানুভূতি বা স্নেহ দেখায় না। জ্ঞান ফিরলে, সে ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, বলে উঠলে "বাপের বাড়ি থেকেই মুর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ঐ নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে, … আমি কাজের লোক সময় কম, হিস্টিরিয়াওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি".[১১] এতকিছু বলা সত্ত্বেও কুমু নীরব থাকলে, সে আরও অসহ্য হয়ে উঠে কুমুকে দাদার চেলা বলেছে, অভিযোগ করে, টাকার লোভে সে নাকি বিয়ে করেছে। মহাজন হিসেবে মধুসূদন তার দাদাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বিক্রি করে দেবার কথা বলে। কোনো প্রতিবাদ না করে কুমু নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়, তার রোমান্টিক স্বপ্ন ভেঙে যায়। তারপর মধুসূদন তার বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দাদার পাঠানো চিঠি, টেলিগ্রাম লুকিয়েছে, নীলার আংটি চুরি করেছে। তাদের "মিলনে কোমল পুষ্পধনু অপেক্ষা ইস্পাতের অসিরই অধিক ব্যবহার হইয়াছিল… স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের সমস্ত মাধুর্য ও সহজ প্রীতিটুকু সে কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতব্যয়িতার সহিত নিঃশেষ করিয়াছে।এই রূঢ় আঘাতে কুমুদিনীর মানস আদর্শ ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়াছে, তাহার সমস্ত শিক্ষা-সংস্কার, আত্মদমন-ক্ষমতা লইয়াও সে এই মূঢ় পাশবিকতাকে স্বামীর ন্যায়সংগত অধিকার বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই"[১২] নিজেকে সরিয়ে রেখেছে, সহ্য করেছে। তবে সব কিছুতে তার নির্লিপ্ত ভাব, নির্লোভ মনোভাব মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছে, সে, স্ত্রীকে অস্বীকার করতে পারেনি। নীরব, শান্ত, ভদ্র সুন্দরী স্ত্রী'কে ভালোবাসতে শুরু করে। মধুসূদন দিন দিন গলতে শুরু করে, চুরি করা সব জিনিস ফিরিয়ে দেয়, অলংকার কিনে আনে, ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করে, ভালোবাসার চেষ্টা করে,সময়ে অসময়ে অন্তঃপুরে চলে আসে, স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে চায়, - "তাহার দাম্ভিক অত্যাচারপ্রিয়তার তপ্তবালুকার মধ্যে একটা অর্ধপরিণত প্রেম ও প্রশংসার অনিবার্য উচ্ছ্বাস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে…। তাহার আদেশের চড়া সুরে একটু অনুনয়ের কোমল আভাস মিশিল।"[১৩] কিন্তু কুম, মধুসূদনের ভালোবাসা মেনে নিতে পারে না, নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাজ করে তার মনে। তাদের ব্যর্থ দাম্পত্য সম্প্ররকের সম্বন্ধে কথক বলেছেন – অল্প সময়কেও অনেক সময় বলে মনে হল, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়তে পারছে না। এই কি তাদের দাম্পত্যের অনন্ত কালের ছবি? দু পারে দুজনে নীরবে বসে –রাত্রির শেষ নেই – মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা"।[১৪] মধুদুদন কুমুদিনীকে ভালোবাসে, তাকে সে পেতে চেয়েছে স্বামীর অধিকারের মধ্য দিয়ে কিন্তু কখনো বল প্রয়োগ করেনি। উপন্যাসের শেষে সে কুমুকে আনতে যায়, কিন্তু কুমু আসতে না চাইলে সে আইনের ভয় দেখায়। শেষে সন্তান সম্ভবা হলে কুমু ফিরে আসে, এবং তাদের পুত্র হয় অবিনাশ ঘোষাল। উপন্যাসের শুরুরে আমরা শুনি তার বয়স ৩২ বছর, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের দাম্পত্যের সম্পর্কের কোনো কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি।

মধুসূদন ও শ্যামাসুন্দরীর সম্পর্ক: মধুসূদনের অন্তঃপুরে থাকা , তারই সমবয়সী বিধবা, ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী, সে মধুসূদন ভালোবাসে, পছন্দ করে, মধুসূদনও তাকে অপছন্দ করে না। শ্যামাসুন্দরী তাকে সেবা করলে তার ভালোই লাগে, কিন্তু মধুসূদন তাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। বিয়ের পর ব্যর্থ দাম্পত্য সম্পর্ক, কুমুদিনীর প্রত্যাখ্যান, বাপের বাড়ি চলে যাওয়া, ব্যবসায় লোকশান হওয়া – সবকিছু মিলে মধুসূদন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে, নিজের অহংকার বজায় রাখার জন্য, শ্যামাকেই গ্রহণ করেছে।কারণ সে তাকে ভালোবাসে, সে, কুমুদিনীর মতো দুষ্প্রাপ্য নয়, বহুদিন থেকে, সে তাকে কামনা করে এসেছে।"এই প্রেমে তাহার কতৃত্বাভিমান তিলমাত্র সংকুচিত হইল না।কোন দুশ্চিন্তাপূর্ণ সমস্যা মাথা তুলিল না, কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা অঙ্কুরিত হইল না"[১৫] কিন্তু মধুসূদন তার স্ত্রীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, সে সম্মান দিয়েছে সেই সম্মান সে শ্যামাকে কখনও দেয়নি, দেবেও না, এমন কি সংসারের দায়িত্বও দেয়নি, ছোট্ট ভাই নবীনের স্ত্রী মোতির মা'ই সংসারের কর্ত্রী।কারণ সে শ্যামাকে কখনো বিশ্বাস করেনি। কেন সে শ্যামাকে আগে নয়, নিজের বিয়ের পর গুরুত্ব দিল? এর যথাযথ উত্তর হল –"শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগেনি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে ··· শ্যামাকে সামলিয়ে চলার একটুও দরকার নেই, তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্য সব সইতে সব করতে সে রাজি, এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুণ মধুসূদনের আত্মমর্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল"।[১৬]

কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক: মধুসুদনের শ্যালক,চ্যাটার্জি পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ হলেন বিপ্রদাস। তিনি শিক্ষিত, রুচিবান এক আদর্শ, শিল্পী মনের মানুষ। মধুসূদনের স্ত্রী'র দাদা, গুরু, শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। তার আদর্শেই কুমুদিনী বড় হয়ে উঠেছে। মধুদূদন তাকে প্রথম থেকেই পছন্দ করে না, কারণ সে শত্রুর বংশধর, এছাড়া তার গভীর আভিজাত্য বোধ রয়েছে। কুমুদিনীকে পছন্দ করলেও, বিপ্রদাসকে সে কখনই মেনে নেয়নি। সুযোগ পেলেই সে কুমুর সঙ্গে সঙ্গে তার দাদাকেও অপমান করেছে। প্রথম আক্রমণ: নূরনগরে বিয়ে করতে আসার সময়, বিপ্রদাস স্টেশনে মধুসূদনদের অভ্যর্থনা করতে গেলে মধু তাকে বলেছে কেন সে এসেছে, যেদিন সে বিয়ে করতে যাবে সেদিন তাকে অভ্যর্থনা করার কথা বলেছে। তবুও বিপ্রদাস অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘাটে বজরা এবং তাতে খাবার রান্নায়ব্যবস্থার কথা জানালে মধুসূদন তার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দেয় --"কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না, দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে -- আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিন সেখানে যাবার কথা।"[১৭] মধুসূদনের মধ্যে কোন ভদ্রতা দেখা দেয় না। বিপ্রদাস দমে যায়, অনেকক্ষণ স্টেশনেই বসে কাটায়।খুব ঠাণ্ডা লাগে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্ত্রী, কুমু যখন বলে - নীলার আংটিটি তার দাদা দিয়েছে, বাস্তবে এর মূল্য যাই হোক না কেন, এটা কাছে অনেক মূল্যবান। সে এটা খুলে নিলেও মধুসূদনকে দেয়নি, মধুসূদন ঈর্ষায় জ্বলে যায়, দাদার আর্থিক অবস্থা নিয়ে মনে মনে ঠাট্টা করে, স্ত্রীর সঙ্গে তার দাদার গভীর স্নেহের সম্পর্কে সে মেনে নিতে পারে না। তার মনে হয় গরিব দাদার আংটি হল শনির সিঁধকাঠি, বিপ্রদাসকে পছন্দ না করার কারণ সম্পর্কে কথক বলেছে -- পুরানো জমিদারের জমিদার নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালাধরে। এও তেমনি"[১৮] স্ত্রীর পুঁতি গাঁথা থলির ভিতর বড় দাদার পাঠানো টেলিগ্রাম, দুই দাদার ফটো ও বড়দাদার হাতে লেখা গীতার শ্লোক প্রভৃতি দেখে মধুসূদনের মন ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠে। বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিতে চায়।স্ত্রীর উনিশটা বছর দাদা বিপ্রদাসের অধিনে, সেটা মধুসূদন ছিনিয়ে নিতে পারলে, সে শান্তি

পাবে।মধুসূদন, তার স্ত্রী ও শ্যালক বিপ্রদাসকে দেখে বুঝেছে, তার অনেক টাকা থাকতে পারে, বংশগত আভিজাত্য বোধ নেই, যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, তাদের আছে।নিজেই স্বীকার করেছে, তার ধন সম্পত্তি এর তুলনায় যথেষ্ট নয়।"বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতিবড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ, চাপড়িয়ে বলতে পারে "কী হে কেমন?" এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কিরকম খাটো হয়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ"।[৯] মধুসূদন সব সময় কুমুদিনীর, তার প্রতি বিরুদ্ধাচরনের, তার দাদাকেই দায়ী করেছে, তাদের মিলনের পথে কুমুর দাদাকে কাঁটা বলে মনে হয়েছে মধুসূদনের, তাই রেগে গিয়ে বার বার স্ত্রীকে বলেছে নূরনগরি চাল ছাড়িয়ে দেবে, দাদার মহাজন হিসেবে দাদাকে পথে নামাবে, সে বলে ওঠে – 'দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও'।

সব মিলিয়ে মধুসুদন এক জীবন্ত সার্থক চরিত্র। ভালোমন্দ মিশিয়ে একজন সাধারণ মানুষ। সে শুধু কর্তৃত্ব করতে চেয়েছে। অনেক কষ্টে সে জীবনে সার্থক হয়েছে, তাই সে আত্ম-অহংকারী।বিপ্রদাস কর্মহীন জীবনযাপন করেছে, সে জানে তাদের আর্থিক অবস্থা আর উন্নতি হবে না, ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেনি, কিন্তু মধুসূদন করেছে, বাবার মৃত্যুর পর থেকে সে আজীবন খেটে গেছে, ব্যর্থ হয়ে থেমে থাকেনি, শুধু আদর্শ আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে বাঁচা যায় না, লড়াই করতে হয়, অর্জন করতে হয়, নিজের জন্য সকলের জন্য।সে কুমুদিনীকে ঠিকই চিনেছে।ব্যবসায়ী মন হলেও সে স্ত্রী শুধু শরীর নয়, মনকেও পেতে চেয়েছে, তার নির্মল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে অভিভূত হয়েছে।কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি বদলাতে পারেনি। উপন্যাসের শেষে কুমুদিনী বাড়ি ফিরতে না চাইলে, আবার সে তাকে হুমকি দিয়েছে।কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে মাঝে মাঝেই নরম হয়েছে, স্ত্রীর ভালোবাসা পাবার জন্য।সে নিজের স্ত্রীকে বাড়ির বড় বৌ বলেই পরিচয় দিয়েছে।মনে মনে তাকে সম্মানও দিয়েছে। সে, তার সংস্পর্শের সকল মানুষকে ঠিক ঠিক চিনেছে।প্রত্যেকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। এমন চরিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিরল।রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বাভাবিক করেই গড়ে তুলেছেন।

সূত্র নির্দেশ:

১) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ. ৬৪/৬৫

২) রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণ:২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩,পৃ.১৭২

৩) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ. ১১

৪) পৃ.৫৫

৫) পৃ.১২

৬) রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণ:২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩,পৃ.১৭৩

৭) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ.৪২

৮) রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণ:২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩,পৃ.১৭২

৯) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ.৫৬

১০) পৃ.৬৮

১১) পৃ.৮৭

১২) রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণ:২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩,পৃ.১৭৩

১৩) তদেব

১৪) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ.১৫১

১৫) রবীন্দ্রনাথ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুনর্মুদ্রণ:২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৭৩,পৃ.১৭৫

১৬) 'যোগাযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮২, ১৮৯৭ শক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭১,পৃ.২৪৬/২৪৭

১৭) পৃ.৫০

১৮) পৃ.৭১

১৯) পৃ.১৪৫